দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও তার প্রতিকার

আলহাজ্জ ডক্টর
মুহাম্মদ মুশাররফ হুসাইন

পূর্ব প্রকাশিতের পর

সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণঃ

সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণ বহুবিধ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের বা অন্য দলের ভাল কাজ, সুনাম, বিজয় ও অগ্রগতিকে সহজভাবে মেনে না নেবার মানসিকতা, সহনশীলতার অভাব, অত্যধিক ক্রোধ, অন্যায়কে অন্যায় মনে না করা, ইসলামের সুমহান আদর্শ, তথা ত্যাগ, ক্ষমা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও অন্যান্য মহৎ গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলাম বা অন্য ধর্মের প্রতি বৈরীভাব এবং সর্বোপরি ধর্মহীন, নীতি-বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা। জোর করে বেআইনীভাবে ক্ষমতা দখলের ইচ্ছা, অবৈধভাবে অন্যের হক নষ্ট করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতার ইন্ধন যোগায়। জটিল বেকার সমস্যা সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক যুবক ছেলে মনে করে লেখাপড়া শিখে চাকুরী মিলে না। তাছাড়া, পড়ালেখার খরচ চালানো দুষ্কর, তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য পড়ালেখার পরিবর্তে ছিনতাই, লুটপাট ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, নিজ নিজ দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে অন্য দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য কর্মসূচী নেয়া অথবা অন্য দলের কর্মসূচীর বিরোধিতার লক্ষ্যে অহরহ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করা।

ইদানীং এ সবই বেশী হচ্ছে। এরই নাম কি গণতন্ত্র? এক শ্রেণীর নৈতিকতা-বিবর্জিত সাংবাদিকতা বানোয়াট, অসত্য ও ভিত্তিহীন লেখার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বীজ ছড়াতে পারে। আসল কথা, যার অন্তরে খোদার ভয় নেই, আল্লাহর নিকট এই নশ্বর জীবনের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করার ভাবনা যার নেই, সে যে কোন প্রকার সন্ত্রাসী কাজ করতে পারে। এমনি ধরনের লোক অন্য দলের কর্মী তো দূরের কথা, তুচ্ছ কারণে নিজ দল বা পরিবারের লোক তথা আপন পিতাকে, ভাইকে, স্ত্রীকে এমনকি নিজ সন্তানকে ঠাণ্ডা মাথায় জবাই করতে কুণ্ঠিত হয় না। এছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম (টিভি) যেভাবে সন্ত্রাসী ঘটনার ইভেন্টস দেখায় তাতে সাধারণ মানুষ বা ছাত্রদের উপর তার প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে নাটকে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ছায়াছবির অনুকরণে যেসব মারামারি, খুন-খারাবী ও সন্ত্রাসীর ঘটনা দেখানো হয় তা আমাদের সমাজে সন্ত্রাস বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেন। তাই উপরোক্ত কারণগুলো দূর করা সম্ভব হলে সন্ত্রাসের মূল উৎস বলে আর কিছু থাকবে না।

সন্ত্রাস দমন আইনের এপিঠ ওপিঠঃ

শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন লিপিবদ্ধ করা থাকলেও সংসদে সকল বিরোধী দলীয় সদস্যের মতামত উপেক্ষা করে সরকার সন্ত্রাস দমন আইন জারি করেছেন। সন্ত্রাস দমন আইন পাস হবার পর হতেই বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এর মাধ্যমে যদিও সন্ত্রাস প্রথমদিকে কিছুটা কমেছিল, তথাপি অনেকে নিছক বিরোধিতার কারণে এর বিরোধিতা করে আসছেন। ইদানীং এই আইনের শিথিলতার জন্য শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস তীব্র আকার ধারণ করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এদেশে সবাই সন্ত্রাস দমনের কথা বলে ঠিকই অথচ বিরোধী দলের সবাই এই "সন্ত্রাস দমন আইন বাতিল হোক" চায়। কারণ, তাদের ভয়, এই আইনের অপব্যবহার করা হবে। কিন্তু, এই যুক্তি কি সর্বদা সঠিক? তিক্ত হলেও সত্য এই যে, রাজনৈতিক দলগুলোর কোনটিই চায় না তাদের দলের কর্মীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য শাস্তি হোক। দলগুলো তাই এ আইনকে রাজনৈতিক রূপ দিচ্ছে। সেহেতু এই আইনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট হৈ চৈ হচ্ছে। যার ফলে সরকার যথোপযুক্তভাবে এই আইন প্রয়োগ করতে পারছে না। অপরদিকে সরকার এই আইনের উছিলায় প্রয়োজন বোধে "সরকার বিরোধী আন্দোলনকে" কঠোর হস্তে দমন করতে পারবে বলে তা বাতিল করতে চায় না।

দ্বিতীয়তঃ সন্ত্রাস দমন আইন উঠিয়ে দেবার পর যদি সাধারণ আইনে সন্ত্রাস দমন না হয় তাহলে বিরোধী দলগুলো সরকারকে "সন্ত্রাস দমনে ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ" বলে চিহ্নিত করবে এবং এই অজুহাতে হয়তোবা সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হতে পারে। মহিলা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার যতই গণতন্ত্রের কথা বলুক না কেন, আসেল একটি দুর্বল সরকার। তাই সন্ত্রাস দমন আইন থাকতে সরকার যদি সন্ত্রাস দমন করতে না পারে তবে এই বিশেষ আইন তুলে নিলে সন্ত্রাস দমন আদৌ সম্ভব নয়। এ হচ্ছে বর্তমান সরকারের চালু করা সন্ত্রাস দমন আইনের এপিঠ-ওপিঠ।

সন্ত্রাস দমন আইনের প্রয়োজনীয়তাঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, সংবিধানে প্রত্যেক সংবিধানবিরোধী কাজ বা অপরাধের জন্য দণ্ডনীয় আইন রয়েছে। তাই শুধুমাত্র সন্ত্রাসের জন্য নতুন করে আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন মোটেই নেই। প্রয়োজন আছে প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ বা জ্বেনা, মানুষ অপহরণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান ছাড়াও ইসলামী শরীয়তে এসব অপরাধ বা পাপ কাজের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান উল্লেখ আছে। এতদসত্ত্বেও তা বাস্তবায়নে আমাদের এই শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে বাধা কোথায়? বস্তুতঃ ইসলামের কঠোর আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন আমাদের সমাজে নেই বলেই সন্ত্রাস বন্ধ না হয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে যে আইনে চোর আরো বড় চোর হয়, ডাকাত আরো বড় ডাকাত হয়, ঘুষখোর আরো বড় ঘুষখোরে পরিণত হয়, যে আইনে জ্বেনা ও গণধর্ষণ (বর্তমান সরকারের দুর্বলতার অবদান)-এর বিচার হয় না, মদ্যপানের শাস্তি হয় না, যে আইনে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক নিজেই ব্যাপক ঘুষ খাবার সুযোগ পান, সেই বৃটিশ সাধারণ আইনই আমাদের সমাজে চালু আছে। আর আমরা প্রায় সবাই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সেই আইনের পৃষ্ঠপোষকতা করছি। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরানে এরশাদ করেছেন,

আল ফিৎনাতু আসাদ্দু মিনাল কাতলে (সূরা.....)।

অর্থাৎ ফিৎনা, ফ্যাসাদ, ফ্যাসিবাদ বা সন্ত্রাস হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ। অন্য কথায়, সন্ত্রাসীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বিজ্ঞ পাঠক, এ ধরনের শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন না করে পুনরায় সন্ত্রাস দমন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা কি আদৌ ছিল?

কে বেশী শক্তিশালী, সরকার না সন্ত্রাসীঃ

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করা বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কি সম্ভব? এদেশে কে বেশী শক্তিশালী, কার দৌরাত্ম বেশী, সরকার না সন্ত্রাসী চক্র? সরকারের অধীনে আনসার, পুলিশ, বিডিআর এবং সর্বোপরি সশস্ত্র সেনাবাহিনী রয়েছে। তারা সরকারের হুকুম তামিল করতে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদা প্রস্তুত। জনগণও সরকারকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাস কেন বন্ধ হবে না? কোথায় গলদ? আর কে-ই বা দায়ী? কে সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে বা অস্ত্র যোগাচ্ছে, সরকার, বিরোধী দল না তৃতীয় পক্ষ?

—চলবে